রাত্রি

কলঙ্কিনী নদী

৬

রাত্রি তার ডিউটি শেষ করে হাসপাতাল থেকে বেড়োতেই চোখে পরলে রাস্তার পাশে থেমে আছে লাল রংয়ের একটা গাড়ী। এই গাড়ীটা সে ভালো করেই চিনে। সে বেশ কয়েকবার সুমিকে এই গাড়ীটাতে চড়তে দেখেছে। সে গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তুফানকে বললো, আপনি বোধ হয় সুমির জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাই না?

তুফান বললো, জী, কিন্তু আপনাকে তো চিনলামনা।

রাত্রি বললো, আমি রাত্রি, সুমি আর আমি একসংগে কাজ করি। আমি কি সুমির ব্যাপারে আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি?

তুফান বললো, স্যরি, আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা, এক্ষুনি সুমি আসার কথা। আপনার সাথে এভাবে আলাপ করতে দেখলে সে খুবই রাগ করবে। সাংঘতিক জেদী মেয়ে সে।

রাত্রি বললো, আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না। সুমি আসবেনা।

তুফান বললো, মানে?

রাত্রি বললো, সুমিকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। আপনি কি জানেন, সুমি কোথায় কোথায় যায়?

তুফান চোখ কপালে তুললো, সে গাড়ীর ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলো। বললো, কি হয়েছে সুমির?

রাত্রি বললো, আপনি ঘাবরাবেন না। ঘাবরানোর মতো কিছু হয়নি। সে অনেকটা আমার উপর রাগ করে হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে গেছে সকালেই। বাসায় টেলিফোন করা হয়েছে। বাসায়ও যায়নি। মোবাইলও ধরছেনা।

তুফান বললো, আসলে সুমির সাথে আমার পরিচয় অল্প কয়দিনের, আমিও ভালো জানিনা। তবে সে একবার বলেছিলো, কোন একটা ওমেনস ক্লাবে সে যায় মাঝে মাঝে। নাম বলেনি।

রাত্রি বললো, আপনি কি আমাকে একটু হেলপ করতে পারেন?

তুফান বললো, কি হেলপ করতে পারি, বলুন?

আসলে সুমি আমার উপর রাগ করে আছে, আমি তাকে খোঁজে বেড় করে ক্ষমা চাইতে চাইছি। আপনার তো গাড়ী আছে। যদি আপত্তি না থাকে, শহরের সব কটা ওমেনস ক্লাবে যদি একটু খোঁজে দেখতাম?

তুফান কোন আপত্তি করলোনা।

সুমি যখন গ্লাসের পর গ্লাস মদ টেনে, বিদেশী মিউজিকের তালে তালে উত্তাল ড্যান্সে মগ্ন, ঠিক তখুনি ড্যান্স বারে রাত্রিকে দেখে অবাক হলো। সুমি ড্যান্স থামিয়ে রাত্রির দিকে এগিয়ে গেলো। বললো, কি ব্যাপার রাত্রি, আমার বিচার করতে এখানে চলে এসেছো? তোমার ভাবনার কোন কারন নেই। রিজাইন লেটার রেডী করা আছে। কালকের ডাকেই পোষ্ট করবো।

রাত্রি বললো, না সুমি, আমি করিম সাহেবের সংবাদটা দিতে এসেছি। করিম সাহেব খুবই ভালো আছেন। ডাঃ সাকীব বলেছেন, আর চার পাঁচ দিনের মাঝেই রিলীজ পাবেন উনি হাসপাতাল থেকে।

রাত্রির কথায় সুমির কান্না পেতে লাগলো। সুমি বললো, তুমি একটা বোকা!

সুমি ড্যান্স বার থেকে ছুটে বেড়িয়ে গেলো। সুমি ক্লাবের বাথরুমে গিয়ে কাঁদতে লাগলো হু হু করে।

রাত্রির মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে বড়ীর পথে ফিরছিলো। আহমেদ সাইকেল চালিয়ে কোথায় যেনো যাচ্ছিলো। রাত্রিকে দেখে সে তার সাইকেল থামালো। বললো, চলো কোথাও বসি।

রাত্রি ছোট এই পার্কের বেঞ্চিতে বসে বিড়বিড় করে বলছে, আমি মনে হয় খুব বেশী স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম।

সে একটু থেমে আবারো বললো, অন্যের তদারকী করা বুঝি সবচেয়ে কঠিন কাজ! তাইতো! সেও একটা মানুষ। তার নিজেরও কিছু চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে!

আহমেদ বললো, রাত্রি, ওদিকে তাকাও! উপরে! আকাশের দিকে!

আকাশে আজ পুর্ণিমার বড় একটা চাঁদ উঠেছে। রাত্রি তাঁকালো সেদিকে। এমন চমৎকার পূর্ণ একটা চাঁদ দেখে রাত্রির মনটা হয়তো ভালো হয়ে যাবে, তাই ভেবেছিলো আহমেদ। অথচ, রাত্রি একবার শুধু আকাশের দিকে তাঁকিয়ে, নীচের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

আহমেদ বললো, এমন পূর্ণ চাঁদ দেখলে আমার গোল পরটা খেতে ইচ্ছে করে, চলো মুসা মিয়ার দোকানে গিয়ে পরটা খাই।

রাত্রির মন সত্যিই খুব খারাপ। খাবারের প্রতি তার কোন ধরনের লোভ এই মুহূর্তে নেই। সে উঠে দাঁড়ালো। বললো, এখন বাসায় যাবো আমি।

এই চাঁদনী রাতে, রাত্রিকে আর একটু কাছে চাইছে আহমেদ। সে রাত্রির সামনে এসে দাঁড়ালো। আহমেদের কি হলো কে জানে। সে রাত্রিকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর বললো, রাত্রি, তোমার চিন্তা ভাবনায় কোন ভুল নেই। আজকে অন্তত মন খারাপ করে থেকোনা। প্লীজ!

রাত্রি তখনো একটা ঘোরের মাঝে ছিলো। সম্বিত ফিরে পেতেই আহমেদকে নিজের বুকের মাঝে দেখে ঠেলে সরিয়ে দিলো। সে কিছুক্ষণ আহমেদের চোখের দিকে তাঁকিয়ে থাকলো। তারপর নিজেই আহমেদকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, আই লাভ ইউ!

আজও ঘুম ভাঙতে দেরী হলো রাত্রির। সে না খেয়ে অনেকটা ছুটতে ছুটতে রওনা হলো হাসপাতালের উদ্দ্যেশ্যে। হাসপাতালের সামনে, সি এন জি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি রাস্তা পারাপারের জন্যে ছটফট করছিলো সে। ঠিক তখুনি সাইকেল চালিয়ে তার পাশে এসে থামলো আহমেদ। আহমেদ একটা মধুবন খেতে খেতে সাইকেল চালাচ্ছিলো। ক্ষুধার্ত রাত্রি, আহমেদের হাতের মধুবনটা দেখে লোভ সামলাতে পারলোনা। সে ছোঁ মেরে মধুবনটা কেড়ে নিলো, আহমেদের হাত থেকে। অর্ধেক খাওয়া মধুবনটা নিজের মুখে পুরে দিয়ে বললো, তুমি কি মধুবন খুব পছন্দ করো নাকি? আমার কিন্তু প্রিয় খাবার।

ঠিক তখুনিই তুফান সুমিকে তার গাড়ীতে নিয়ে, হাসপাতালে ঢুকার কাছাকাছি সিগনালে এসে থামলো। সুমি গাড়ীর জানালা দিয়ে মাথা বেড় করে ডাকলো, রাত্রি সিস্টার কি এই সাত সকাল থেকেই ডেটে নেমে পরেছো নাকি?

হঠাৎ সুমির কথা কানে যেতেই রাত্রি বললো, তোমার মতো না। তা তুমি এই সাত সকালে কোথায় চললে?

সিগনালে সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই তুফান গাড়ী চালাতে শুরু করলো। সুমি গাড়ী চলার ফাঁকে বললো, রত্রি সিস্টার যেভাবে গতকাল যন্ত্রনা করলো, আমার আর কি করা?

রাত্রি আহমেদকে বললো, এর মানে কি? সুমি কি বলতে চাইলো?

আহমেদ বললো, তুমি তদারককারীর পরীক্ষাতে পাশ করেছো, এমনি একটা গন্ধই তো পাওয়া গেলো, তার চে বড় কথা, পথচারীর জন্যে সবুজ বাতি জ্বলছে, তোমার আবার লেইট হবে। তাড়াতাড়ি নার্স স্টেশনে যাও।

রাত্রি ছুটতে ছুটতে চললো হাসপাতালের ভেতরের দিকে।

রাত্রি রোগীদের কক্ষে একটা টহল দিয়ে, এক থালা ভাপা পিঠা নিয়ে ফিরে এলো নার্স স্টেশনে। সে ভেতরে ঢুকেই চেচিয়ে বললো, এই সুমি তুমি লোকমান সাহেবের বেডের উপর ভাপা পিঠাগুলো দেখেও সীজ করলেনা কোনো? তুমি কি জানোনা, রোগীদের বাইরের খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ?

সুমি বললো, ওমা আমি কি করে বলবো, ওগুলো কার খাবার। লোকমান সাহেবের আত্মীয় স্বজনেরা নিয়ে এলো। ভেবেছিলাম লোকমান সাহেবের আত্মীয় স্বজনেরা নিজেরাই খাবে। তাই কিছু বলিনি। তা ছাড়া?

রাত্রি বললো, তা ছাড়া কি?

সুমি বললো, তা ছাড়া আমার ধারনা, ছিলো, তুমি তো একবার টহল দিতে যাবেই। তোমার তো আবার ভাপা পিঠা খুবই পছন্দের। ঐ ভাপা পিঠাগুলো দেখে লোভ সামলাতে না পেরে তুমি নিজেই সীজ করে আনবে।

রাত্রি অনেকটা সহজেই বলে ফেললো, তা ঠিক!

তারপরই সে হুশ ফিরে বললো, কি? আমার সাথে ফাজলামী করছো? এরকম জানলে তো কাল রাতে তোমার কাছে যেতামই না।

সুমি বললাম, আমি তো রিজাইন দেয়ার জন্যে রেডীই ছিলাম, তুমিই না আমার মাথাটা খারাপ করে দিলে?

রাত্রি বললো, ওহ, সবই তো আমার দোষ! ঠিক আছে, রিজাইন লেটার টা আবার লেখো। এক্ষুনি লেখো। দরকার হলে, আমিও হেলপ করবো তোমাকে।

রাধিকা এগিয়ে এলো, বললো, তোমরা দুজন সকাল থেকে কি শুরু করে দিলে? একটু থামবে?

টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সুমি ছুটে গিয়ে রিসীভ করলো। ম্যাটার্নিটি থেকে, রাধিকাকে চাইছে। সুমি রাধিকাকে বললো, আপনার টেলিফোন।

রাধিকা টেলিফোন রিসীভ করলো। টেলিফোনের কথাগুলো শুনে তার মনটা কেমন যেনো খারাপ হয়ে গেলো। রাত্রি বললো, কি ব্যাপার?

রাধিকা বললো, দিলের জ্বর উঠেছে নাকি? রাত্রি, আমি একটু ম্যাটার্নিটিতে যাবো। ভালো কথা মাহমুদ সাহেবকে দশটায় ইনজেকশন দেবার কথা। তুমি কি একটু দেখবে?

রাধিকা ছুটতে ছুটতে বেড়িয়ে গেলো।

সুমি রাত্রির সংগে তিনশ এগার নম্বর কক্ষে গেলো। তিনশ এগার নম্বর কক্ষে নুতন দুজন রোগী ভর্তি হয়েছে। একজন লোকমান, আর অন্যজন মাহমুদ। বাবুল, বাদশা আর রতন তাদেরকে, কক্ষে ঢুকতে দেখে লোকমান সাহেবের বেডে গিয়ে জড়ো হলো।

রাত্রি সুমিকে আদেশ করে বললো, সুমি, মাহমুদ সাহেবের হাতের রগটা ঠিকমতো খোঁজে বেড় করে, ইনজেকশনটা দিয়ে দাওতো।

মাহমুদ বললো, শুনলাম, উনি নাকি নবাগতা নার্স, কোন সমস্যা নাইতো?

রাত্রি বললো, কোনই সমস্যা নাই। সুমি খুবই এক্সপার্ট ইনজেকশনের ব্যাপারে।

সুমির কেমন যেনো হাত কাঁপছিলো। সে রাত্রিকে বললো, সিস্টার, উনি মনে হয় ভয় পাচ্ছে, না হয় তুমিই দিয়ে দাও ইনজেকশনটা।

রাত্রি বললো, আরে না, তুমি উনাকে দেখিয়ে দাওতো তোমার হতের যাদুটা?

সুমি বললো, সিস্টার, আমার মনে হয় তোমারও ভয় লাগছে উনাকে ইনজেকশন দিতে, তাই না?

রাত্রি বললো, ভয়ের কি আছে, ইনজেকশন দেয়া একটা ব্যাপার হলো নাকি?

বাবুল লোকমান সাহেবকে ফিশ ফিশ করে বলছে, এই দুজন হলো, এই হাসপাতালের সেরা দুজন নার্স।

লোকমান বললো, তাই নাকি? দেখতেও তো চমৎকার!

বাদশা বললো, চমৎকার আর কি দেখলেন? এই না শুরু!

লোকমান খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলো তাদের। বললো, তাই নাকি?

সুমি রাত্রিকে বললো, তাহলে উনাকে ইনজেকশনটা দিচ্ছো না কোনো?

রাত্রি বললো, দিচ্ছো না কোনো বলছো কেনো? তোমাকে শিখতে হবে না?

সুমি বললো, এইতো, তোমার আত্মবিশ্বাস নেই। আত্মবিশ্বাস থাকলে, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে ইনজেকশনটা দিয়েই দিতে উনাকে এতক্ষণে।

রাত্রির মেজাজটা খানিকটা খারাপ হলো। সে সুমির হাত থেকে ইনজেকশনটা কেড়ে নিয়ে বললো, তোমাকে বলেছে? এই দেখো, আমি কেমন করে উনাকে ইনজেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি, দেখবে, একটুও ব্যাথা লাগবেনা উনার।

রাত্রি মাহমুদের হাতের রগটা খোঁজে বেড় করে ইনজেকশনের সুইটা ঢুকাতেই সে কঁকিয়ে উঠলো, উফ ব্যাথা লাগছে তো।

সুমি বললো, এই তো উনি বললো ব্যাথা লাগছে।

রাত্রি ইনজেকশনের সুইটা মাহমুদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, কি বললেন? ব্যাথা পেয়েছেন?

রাধিকা দিলকে নিয়ে ছুটে চললো, নারী ও শিশু বিভাগের দিকে। নারী ও শিশু বিভাগে পৌঁছুতেই সেখানকার নার্স আফসানা তাকে বললো, রাধিকা সিস্টার, সার্জারী বিভাগ থেকে এই মাত্র টেলিফোন আসলো, কি যেনো সমস্যা হয়েছে, আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বললো।

রাধিকা বললো, ঠিক আছে আফসানা, তাহলে দিলকে একটু দেখবে তুমি? আমি এক্ষুণি ফিরে আসবো।

তিনশ এগার নম্বর কক্ষে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। রাত্রির দেয়া ইনজেকশনে ব্যাথা পেয়েছে বলাতে রাত্রি ভীষণ ক্ষেপে গেছে মাহমুদের উপর। সে, আর ব্যাথা পাবেনা বলে, জোড় করে মাহমুদকে ইনজেকশন দিতে চাইছে। বেচারা মাহমুদ বারবার হাত সরিয়ে নিচ্ছে। এমন একটা কাণ্ড দেখে লোকমান বেশ ভয়ই পেয়ে গেলো। সে বিড় বিড় করে বললো, এ আমি কোন জগতে এসে পরলাম।

রতন বললো, ভয় পাবার কিছু নেই লোকমান সাহেব, এই আর কি দেখছেন? কয়েকদিন থাকেন এখানে, চিকিৎসা লাগবেনা, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবেন। এই আমাদের দেখছেন না। হাসপাতাল ছাড়তে তো ইচ্ছেই করছেনা।

লোকমান বললো, কি জানি বাপু, ভালো হলেই ভালো।

রাধিকা এসে ঢুকলো তিনশ এগার নম্বর কক্ষে। সে চিৎকার করে বললো, এসব কি হচ্ছে রাত্রি।

রাত্রি বললো, দেখেন না, আমি ইনজেকশন দিতে চাইছি। আর উনি হাত সরিয়ে নিচ্ছে।

রাধিকা মাহমুদকে বললো, কি ব্যাপার মাহমুদ সাহেব?

মাহমুদ বললো, না আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে ভরসা পাইনা। এই মেয়ে আমার রগ টগ সব ছিড়ে ফেলবে।

রাধিকা হাসলো, বললো, ঠিক আছে, আমিই আপনাকে ইনজেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি।

রাধিকা রাত্রির হাত থেকে ইনজেকশনটা নিয়ে মাহমুদকে বললো, আপনার রগ তো বরাবরের মতোই খুব ফোলা ফোলা। খোঁজে বেড় করার দরকার হয়না।

মাহমুদ হাসতে হাসতে বললো, কি যে বলেন? বয়স হয়েছে, তাই রগগুলো ফুলে উঠেছে, এই আর কি।

রাধিকা মাহমুদের হাতের রগে আঙুল দিয়ে টিপে ধরে রাত্রিকে বললো, রাত্রি, রগে এভাবে কিছুক্ষণ টিপে ধরে রাখলে ইনজেকশনে ব্যাথা পাবার কথা না।

তারপর সুমিকে বললো, সুমি স্যাভলোনে তুলা ভিজিয়ে দাওতো?

সুমি ফোরসেপ দিয়ে স্যাভলোনে ভেজা তুলা এগিয়ে দিলো। রাধিকা বললো, সুমি এবার একটু গজ দাও।

রাত্রি সুমিকে বললো, সুমি মনযোগ দিয়ে ঠিকমতো সব শিখে নাও, রাধিকা সিস্টার কিভাবে করছে?

রাধিকা রাত্রিকে বললো, সাথে সাথে তুমিও।

রাত্রি খানিকটা বিব্রতবোধ করলো। সে মনযোগ দিয়ে রাধিকার ইনজেকশন দেয়ার পদ্ধতিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। রাত্রির মনযোগী চেহারাটা দেখে সুমি হাসি চেপে রাখতে পারলোনা।

মাহমুদকে ইনজেকশন দিয়ে কক্ষের বাইরে গিয়ে সুমি বললো, রাত্রি সিস্টার যদি রাধিকা সিস্টারের মতো করে ইনজেকশন দেয়াটা শিখিয়ে দিতো, তাহলে এত সমস্যা হতোনা।

রাত্রি ক্ষেপে গিয়ে বললো, আমি যদি সুপারভাইজার হতাম তাহলে তোমাকে আজকেই চাকরী থেকে ছাটাই করে দিতাম।

রাধিকা কড়া চোখে তাঁকালো রাত্রির দিকে। বললো, বোকার মতো কি বলো, চাকরী থেকে ছাটাই করার ক্ষমতা নার্স সুপারভাইজারের আছে নাকি?

তাহমিনা ছুটে এলো এদিকে। সে বললো, রাধিকা সিস্টার, নারী ও শিশু বিভাগ থেকে টেলিফোন এসেছিলো। আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।

রাধিকা বললো, তাইতো? তাহমিনা, তুমি একটু তিনশ চার নম্বর কক্ষে যাবে, তারপর তারপর, তিনশ বিশেও একটা খোজঁ নিবে।

তাহমিনা খুবই অবাক হলো। তিনশ চার আর তিনশ বিশ দুটো কক্ষের ভারই রাত্রির উপর। অথচ, রাধিকা তাকে নির্দেশ দিয়ে গেলো? সে অবাক হয়ে রাত্রি আর সুমির দিকে তাঁকালো। তারা দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

দিলের সামান্য জ্বরের জন্যে, নার্স স্টেশনে সমালোচনার একটা চমৎকার সুযোগ ঘটে গেলো।

লতিফা বললো, এই জন্যেই বলি, বিয়ে করা মেয়েদের নার্সের কাজ করতে নেই।

রাত্রিও যোগ দিলো, আমিও বলি তাই। আরে বাবা বিয়ে করে একটু সংসারী হবে তা না, কি মজা এই চাকরীতে? আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো কক্ষনো চাকরীই করবোনা।

লতিফা বললো, হাসপাতালে রোগী ফেলে, নিজের মেয়ের জন্যে ছুটাছুটি করে, এমন নার্সের কথা শুনেছো কেউ?

সবাই একই সংগে বললো, না।

রত্রি বললো, আচ্ছা নার্স সুপারভাইজারে ভাতা কত?

রোকেয়া বললো দুশ টাকা।

রাত্রি বললো, এত টাকা?

সুমি বিড় বিড় করে বললো, মাত্র? আমার লিপস্টিকের দামও তো হবেনা।

রত্রি কি যেনো হিসাব করছে। দুশ টাকা হলে কি কি কেনা যাবে, মনে মনে তার একটা লিষ্ট করতে লাগলো সে।

লতিফা বললো, জুনিয়রদের কাজে লাগিয়ে নিজে মেয়ের দেখাশুনা করতে চলে যায়, এমন সুপারভাইজারকে দিয়ে কি আশা করা যায় বলো দেখি?

রাত্রি বিড় বিড় করে বললো, রাতে সবাইকে পেট ভরে না খাওয়ালে কি আর রক্ষা আছে?

কথাগুলো বলে রাত্রি ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পরলো, রাধিকা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, রাধিকা সিস্টার?

লতিফা দরজার দিকে ঘুরে তাঁকালো, বললো, রাধিকা সিস্টার কি সব শুনে ফেলেছেন নাকি?

রাধিকা বললো, শুনবোনা কেনো? সব শুনেছি।

বাঘে মোষের একটা লড়াই শুরু হবে আশংকা করে সবাই নিজ নিজ কাজে মনযোগ দিলো।

রত্রি বললো, সিস্টার, দিল কেমন আছে?

রাধিকা বললো, এখন কাজে যাও।

সাকীব ছুটে এসে ঢুকলো নার্স স্টেশনে। সে বললো, দিলের নাকি জ্বর উঠেছে?

রাধিকা ফিশফিশ করে বললো, তোমাকে আবার নুতন করে খোঁজ নিতে হবে না, যাও এখন।

সাকীব বললো, বলো কি? আমার এত আদরের মেয়ে, আমার একটা চিন্তা আছেনা?

রাধিকা কানে কানে ফিশ ফিশ করে বললো, এত চিন্তার কারন নেই। শিশু বিভাগের আফসানাকে বলে এসেছি। সে দেখবে।

লতিফা আঁড়ি পেতে শুনে বললো, নারী ও শিশু বিভাগের সুপার বড় দজ্জাল মহিলা। পরে দেখবেন আমাদের সুপারকে রিপোর্ট করে বসেছে।

রাধিকা খানিকটা ক্ষেপে গিয়ে বললো, আমি অন্যদের মতো এতটা ভোতা না যে, নারী ও শিশু বিভাগের সুপার, আমার নামে রিপোর্ট করবে, হুম।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সাকীব দেখলো, পাশে রাধিকা নেই। সে উঠে বসতেই দেখলো, ওপাশে দিলের বেবী বেডের পাশে মেঝেতে বসে ঘুমুচ্ছে রাধিকা।

সাকীব বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে থার্মোমিটার নিয়ে এগিয়ে গেলো সেদিকে। দিলের গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখলো, জ্বর নেই। সে রাধিকার পিঠে একটা চাপর দিয়ে বললো। রাধিকা বিছানাতে যাও।

রাধিকা চোখ খুলে, উঠে দাঁড়াতে যেতেই মাথা ঘুরে পরে যেতে লাগলো। সাকীব ধরলো তাকে। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলো বেশ গারম। সাকীব বললো, তোমার তো জ্বর উঠে গেছে দেখছি।

রাধিকা বললো, আরে না, আমি ভালো আছি।

সাকীব থার্মোমিটার দিয়ে রধিকার গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখলো। মাপা শেষ হতেই বললো, প্রচণ্ড জ্বর! তুমি শুয়ে আজ বিশ্রাম করোতো?

সাকীব হাসপাতালে যাবার জন্যে রেডী হচ্ছিলো। রাধিকা বিছানা থেকে ডাকলো, ডাক্তার?

সাকীব বললো, কি বলো?

রাধিকা বললো, একটু এদিকে আসোনা?

সাকীব বিছানার পাশে এসে বসলো। রাধিকা বললো, আরো কাছে এসো।

সাকীব ভাবলো চুমু টুমু দেবে কিনা কে জানে। সে রাধিকার ঠোটের কাছাকাছি এগিয়ে গেলো।

রাধিকা বললো, ডাক্তার?

সাকীব বললো, হুম?

রাধিকা বললো, তুমি?

সাকীব বললো, হুম?

রাধিকা বললো, আমার?

সাকীব বললো, হুম?

রাধিকা বললো, জ্বরটা নেবে?

রাধিকা কাশতে লাগলো। সাকীব বললো, আহ্লাদের আর কথা নাই না? বিশ্রাম করো। আমি দিলকে নিয়ে গেলাম।

মিনা রায় নার্স স্টেশনে এসে ঘোষনা করলো, জ্বরের জন্যে রাধিকা আজকে ছুটিতে আছে।

রাত্রি বললো, হুউম? রাধিকা সিস্টারেরও বুঝি জ্বর উঠে?

রোকেয়া বললো, তাহলে, সুমি আর রাত্রির কি হবে?

সাজেদা বললো, একটার পর একটা অঘটন ঘটাবে আর কি এই দুজনে।

লতিফা মনে মনে হাসলো, বললো, এমন করে বলতে নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লতিফা মিনা রায়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, ম্যাডাম, আজকের নার্স সুপারভাইজারের ভারটা?

মিনা রায় ডাকলো, রাত্রি?

রাত্রি লফিয়ে উঠে বললো, আমি? আমাকে আজকের সুপারভাইজারের দায়ীত্বটা নিতে হবে?

মিনা রায় রাত্রির দিকে এগিয়ে গেলো। তার কাছাকাছি গিয়ে বললো, তোমার ড্রেসের কলারটা উল্টে আছে। সেই কখন থেকে আমার চোখে পরছে সেটা। এলোমেলো কোন ব্যাপার চোখে পরলে আমার আলোচনায় মন বসেনা।

মিনা রায় নিজেই রাত্রির কলারটা ঠিক করে ঘুরে দাঁড়ালো, বললো, তারপর কি কথা যেনো হচ্ছিলো?

লতিফা বললো, ঐ যে, আজকের সুপারভাইজারের ভারটা?

মিনা রায় হাসলো, ও সেই কথা? আজকের ভারপ্রাপ্ত সুপারভাইজার লতিফা, এটা কি আবার বলে দিতে হবে নাকি?

মিনা রায় কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেলো।

মিনা রায় চলে যেতেই লতিফা বললো, ঠিক আছে, তাহলে আজকের সবার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

লতিফা বলতে লাগলো, তিনশ বারো নম্বর কক্ষের ভার তাহমিনার উপর। সেখানে রোগীর সংখ্যা নয় জন, তার মাঝে একজনের মাথায় জখম আছে, ঘন ঘন কেয়ার রাখার খুবই দরকার।

রাধিকা ঘড়ির দিকে তাঁকিয়ে দেখলো, সাড়ে আটটা বাজে। সে বিড় বিড় করে বললো, সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার সময়তো এখন।

সে বেডের পাশ থেকে টেলিফোনের হ্যাণ্ডসেটটা তুলে নিতে হাত বাড়ালো। তার কাঁপা হাতের ছোয়াতে মাটিতে পরে গেলো হ্যাণ্ডসেটটা। সে গড়িয়ে মেঝেতে নেমে হ্যাণ্ডসেটটা তুলে হাসপাতালের সার্জারী বিভাগে ফোন করলো।

রাত্রি ফোন রিসীভ করে অবাক হয়ে বললো, সিস্টার, শরীর কেমন তোমার?

রাধিকা বললো, আমার কথা ভাবতে হবে না। শুনো, তিনশ পাঁচে জুবায়ের নামে যে রোগীটা আছে তার দশটায় ইনজেকশন দেবার কথা, আর!

রাত্রি বললো, তোমাকে ভাবতে হবেনা, কাজের নির্দেশ সব ঠিকমতো দেয়া হচ্ছে।

রাধিকা বললো, কে? লতিফা?

রাত্রি বললো, হুম।

লতিফা বললো, কার টেলিফোন? রাধিকার?

লতিফা টেলিফোনের স্পীকারটা অন করে দিলো। রাধিকার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে তখন।

রাধিকা বলছে, শোন রাত্রি, সুযোগ পেয়ে লতিফা একটু দাপট দেখাতে পারে। ঠিকমতো শুনবি তার কথা, ঝগরাঝাটি যেনো করিসনা। আর শোন, তিনশ নয়ে আজকে নুতন রোগী ভর্তি হবার কথা।

লতিফা রাত্রির হাত থেকে রিসীভারটা কেড়ে নিয়ে বললো, রাধিকা সিস্টার, শরীর খারাপ নিয়ে আপনাকে আর লেকচার দিতে হবে না। আপনার অবগতির জন্যে বলছি যে, আপনি না থাকলেও এই হাসপাতালের বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবেনা।

লতিফা খুট করে রাখলো রিসীভারটা।

আহমেদের এখনো নির্ধারিত চেয়ার টেবিল নাই। সে সাকীবের বিশাল সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার এক কোনে বসে। এই মুহুর্তে সাকীব নেই। আশেক এক গাদা ফাইল এনে সাকীবের টেবিলের উপর ছুরে ফেললো। তারপর বললো, আহমেদ সব কটা ফাইল চেক করে দেখো, কোন রোগীর কি রোগ, আর কি চিকিৎসা করা হচ্ছে। আহমেদ লক্ষ্য করলো ফাইলের ধাককায়, দিলের বাঁধানো ছবিটা ছিটকে গেলো। সে বললো, কি করলেন ডাঃ আশেক, ডাঃ সাকীব দেখলে তো ভীষণ রাগ করবে।

আহমেদ দিলের ছবিটা তুলে আবার সাজিয়ে রাখলো।

আশেক বললো, মেয়ের প্রতি আদর শুধু এখনি। দেখবে একদিন, এই মেয়েই বড় হয়ে বাবাকে বলবে বুড়ো। আর বুড়ো বাবা কন্যার বিয়ের দায়ে ঘর থেকে ধুর ধুর করে তাড়িয়ে দেবে মেয়েকে।

টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আশেক বললো, টেলিফোন ধরছোনা কেনো? হাসপাতালে টেলিফোন ধরতে হয় প্রথম রিংয়ে। এক সেকেণ্ডে রোগীর মহা বিপদ হয়ে যেতে পারে।

টেলিফোন এলো নারী শিশু ও বিভাগ থেকে। দিলকে কিছুদিনের জন্যে সেখানকার নার্স আফসানা দেখাশোনা করবে, এমনিই একটা কথা হয়েছিলো। অথচ, হঠাৎই আফসানাকে বাড়ীতে যেতে হবে। সে দিলকে নিয়ে যাবার জন্যে সাকীবকে চাইছে। সাকীব তখন অপারেশন থিয়েটারে।

রাত্রি দেখলো, আহমেদ কাঁধে একটা ব্যাগ আর দিলকে কোলে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। রাত্রির কাছাকাছি এসে সে দিলকে বাড়িয়ে ধরে বললো, রাত্রি, একটু ধরতো।

রাত্রি দিলকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো।

আহমেদ তার কাঁধের উপর থেকে ব্যাগটা বেঞ্চির উপর রেখে ব্যাগের সব বেড় করে বলতে লাগলো, রাত্রি এটা হলো দিলের দুধের সরঞ্জাম, এটা হলো পাম্পাস, এটা হলো!

রাত্রি বললো, কি ব্যাপার? তুমি কি আমাকে দিলের দেখাশোনা করতে বলছো নাকি?

আহমেদ বললো, তো আর কাকে বলছি?

রাত্রি বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমি পারবোনা।

রাত্রি আহমেদের কোলের উপর দিলকে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলো।

আহমেদ ডাকলো, রাত্রি দাঁড়াও, আমি বাচ্চাদের কিছু বুঝি টুঝি না, প্লীজ!

রাত্রি থামলো। সে বললো, আমিও তো জানিনা। আমি কি বাচ্চা জন্ম দিয়েছি নাকি কখনো?

আহমেদ বললো, তুমি যেভাবে বলছো, তাতে মনে হয় আমি দশ পনেরটা ছেলে মেয়ের বাবা।

রাত্রি আর আহমেদের ঝগড়াতে দিল কাঁদতে লাগলো। রাত্রি আর আহমেদ দুজনেই দিলকে আদর করতে লাগলো।

রাধিকা যখন জ্বরে কাতর ঠিক তখুনি দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠলো। সে দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলো, মিনা রায়। মিনা রায়কে দেখে রাধিকা কি করবে, বুঝতে পারছিলো না। সে বললো, ম্যাডাম আপনি? ভেতরে আসুন। কিছু মনে করবেননা, ঘর টর একেবারে আগোছালো।

মিনা রায় বললো, তোমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম করো। আমাকে বরং তোমাদের রান্না ঘরটা দেখিয়ে দাও।

মিনা রায় এক বাটি হালুয়া নিয়ে রান্না ঘর থেকে ফিরে এলো। রাধিকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, মুখে দিয়ে দেখোতো, তোমার ভালো লাগে কিনা?

রাধিকা এক চামচ হালুয়া মুখে দিয়ে বললো, হুম টেষ্টী, কিভাবে বানালেন? একবার আমাকে শিখিয়ে দেবেন কিন্তু।

মিনা রায় বললো, অবশ্যই। তুমি আগে সুস্থ হয়ে উঠো।

রাধিকা বললো, হাসপাতালের কথা বলেন। রাত্রি আর নদী মনে হয় অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। লতিফা নিশচয় তাদের বকাঝকা করছে।

মিনা রায় হাসলো। বললো, রাধিকা, চারিদিকের মানুষগুলোকে আর একটু প্রশ্রয় দিতে শেখো। আমি জানি, সার্জারী বিভাগের নার্স স্টেশনে তোমার আবদান সবচেয়ে বেশী। ধরতে গেলে তোমার নিজের হাতে গড়া এই নার্স স্টেশন। তারপরও একটা কথা বলি তোমাকে। নার্স তৈরী করা আর ছেলেমেয়ে মানুষ করা একই রকম। ছেলেমেয়েদের যেমন বেশী শাসন করলে, তারা আর মা বাবার কথা শুনেনা, লুকিয়ে ছোটখাট অপরাধ করতে শুরু করে, তোমার ঐ নার্স স্টেশনটাকে সেরকম মনে করে নাও। মাঝে মাঝে নার্সদেরও একটু লাই দেবে। আমি জানি, এদেশে কর্মজীবী মহিলাদের অনেক সমস্যা। বিশেষ করে বিয়ের পর, বাচ্চা কাচ্চা হবার পর। কিন্তু আমি চাই, মেয়েরা বিয়ে করে বাচ্চা লালন পালন, সংসার ধর্ম সব কিছু করে যেনো চাকরী করতে পারে, এমন একটা পরিবেশ। সেই পরিবেশটা তৈরী করতে হলে, সবচেয়ে বেশী দরকার সবার মন যোগিয়ে চলা। তাতে করে হয়তো তোমার নীতীতে বাঁধতে পারে, কিছু করার নেই।

রাধিকা কেমন যেনো উদাস হয়ে গেলো।

মিনা রায় বললো, কি হলো রাধিকা? কি ভাবছো? আমি আবার বেশী জ্ঞান দিয়ে দিলাম নাকি?

রাধিকা বললো, না কিছুনা।

চলবে